Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.64-70
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘নীরবিন্দু’-র নীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর জীবনদর্শন

সুমনা ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Nirendranath Chakraborty was a legendary poet in the context of Modern Bengali literature. From the beginning to the end of his life, he devoted himself to creative literary work. He developed himself bit by bit through life's ups and downs, brokenness, the village environment, various personal experiences, interactions with different people, and nature. Just as an artist carves out a piece of stone to reveal an unimaginable figure, he discovered himself bit by bit. He mainly preferred poetry while also writing prose. He knew he had his own poetry style, helping him reach many people. He never aimed to measure his creation by quantity but expressed what he could. The article delves into how Narendranath transitioned into the poet Narendranath, focusing on his journey of ‘becoming’, especially highlighted in his autobiographical book ‘Nirbindu’.

Keywords: Nirendranath Chakraborty, poetry, Person, village environment, imagination, reader.

মূল আলোচনা: গভীর উপলব্ধির সহজ প্রকাশ যাঁর প্রাণে, সেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আজ আমি এই মর্মে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করবো। কবির সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে, তাঁকে খুব ভালো করে জানতে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও বেড়ে ওঠাকে ভালো করে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কীভাবে তিনি ব্যক্তি নীরেন্দ্রনাথ থেকে কবি নীরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার পথে যাত্রা করেছেন এবং হয়ে উঠেছেন। এই ‘হয়ে ওঠা’-র বিষয়টি আমাদের মূল অন্বিষ্ট। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর তিনি বাংলাদেশের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর বাবা জীতেন্দ্রনাথ চন্দ্রবর্তী ছিলেন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। মা প্রফুল্লনলিনী দেবী। তাঁদের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার মানকর হলেও তাঁর পিতামহ লোকনাথ চক্রবর্তী কর্মসূত্রে কলকাতায় এসে জীবনের বেশ কিছুটা সময় কাটালেও পরবর্তী সময়ে তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চান্দ্রায় চলে আসেন। এই যে সবকিছুর মধ্যে থেকেও নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নেওয়া, নগর জীবনের বিলাসবহুল, কর্মব্যস্তময় জীবন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া, এ যেন তাঁর বনবাস যাত্রার সামিল। চান্দ্রা গ্রামের সহজ সরল জীবন প্রণালীই যেন তাঁর বনবাস। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, কবির বাবা ও ঠাকুরদা দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলার কথা একবারও তাঁদের মনে হয়নি। কারণ, গ্রামের বাড়ির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের শিকড় আলগা হবার ভয়ে। এই যে

গ্রামজীবনের প্রতি যে নিবিড় ভালোবাসা, আত্মিক টান তা আমরা নীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাই।— "পুকুর, মরাই, সবজি বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি/ তার মানেই তো বাড়ি। তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ,/ নিকিয়ে নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান্-টান্"[১]

নীরেন্দ্রনাথের বাবা কলকাতা কলেজে অধ্যাপনা করলেও তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে এই চান্দ্রা গ্রামেই দাদু ও ঠাকুমার ছত্রছায়ায়, গ্রাম বাংলার প্রকৃতির সহজ শ্যামল স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে। গ্রামে তিনি কাটিয়েছেন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মধ্যে ইচ্ছামতো দৌড়ঝাঁপ করে। কখনো গাছে উঠেছেন, কখনো পুকুর সাঁতরে পারাপার করেছেন, আবার কখনও বা গ্রামের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেছেন। এই যে প্রকৃতির কোলে থেকে তাকে নিবিড়ভাবে চেনা ও জানার মধ্যে দিয়ে জীবনের পাঠ নিচ্ছেন তিনি, তা পরবর্তী কালে তাঁর সৃষ্টির পরতে পরতে আমরা লক্ষ করেছি।

তাঁর ঠাকুরদা লোকনাথ চক্রবর্তী কবিকে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে বাস্তব জীবনের মৌলিক সত্যের পাঠ দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের ভীত গড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তাঁর ঠাকুমা যখন কবিকে পড়াশোনা শেখার জন্য একদিন রাত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতায় তাঁর বাবা-মার কাছে পাঠানোর কথা পাড়েন তখন তাঁর পিতামহ জানান—

> দ্যাখো, ওর বয়স এখনও ছ'বছর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এখনই ও সাঁতার কাটতে পারে, গাছে উঠতে পারে, একটা টাকা দিয়ে হাটে পাঠালে জিনিসপত্র কিনে তারপর বাড়িতে ফিরে বাকি পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দিতে পারে, কখন কোন ফসলের বীজ বুনতে হয় কখন কোন ফসল কেটে ঘরে তুলতে হয় তাও বোধ হয় ও কারোও চেয়ে কিছু কম জানে না, তার উপর আবার শুভঙ্করের আর্যা ও খনার বচন যে মুখস্থ বলতে পারে, সে কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। তা কলকাতার কোন ইস্কুল এই বয়সে এর চেয়ে বেশি ওকে শেখাতে পারত?[২]

ঠাকুরদা র ইচ্ছা ছিল আসলে নাতিটি তার কাছে থেকে গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করুক। যদিও পরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়।

আবার অন্যদিকে তাঁর ঠাকুমাও ছিলেন অতিশয় কঠিন ধাতের মহিলা। তিনি নীরেন্দ্রনাথকে পুকুরে স্নান করতে নিয়ে যাবার সময় আচমকা পুকুরের জলে ঠেলে ফেলে দিতেন। নীরেন্দ্রনাথ অথৈ জলে নাকানি চোবানি খেতে খেতে শিখে যাচ্ছেন কীভাবে সাঁতার কাটতে হয়। এভাবেই তাঁর ঠাকুমা তাঁকে শিখিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে জীবন যুদ্ধের অংশীদার হতে হয়। জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতে কীভাবে লড়াই করতে হয়, হেরে যেতে যেতেও কীভাবে টিকে থাকতে হয়। জীবনের এই কঠিন সত্যের পাঠ এত সহজ সাবলীলভাবে আমরা কোনো স্কুল কলেজে পেতে পারি কি?

নীরেন্দ্রনাথের যখন দু বছর বয়স তখন তাঁর মাকে কলকাতার বাসাবাড়ির সংসার সামলানোর কাজে কলকাতায় যেতে হয়। আর ছোট্ট কবি থেকে যায় দাদু-ঠাকুমার কাছে, 'নীরবিন্দু'-তে কবি নিজেই জানান যে, ছোটবেলার একটা বড় অংশ দেশের বাড়িতে থাকার জন্য মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক, তাতে অনেকখানি ফাঁক থেকে যায় তাঁর ক্ষেত্রে, তিনি একদিন ভাত খাবার সময় গল্প বলে খাইয়ে দেবার আবদার করতেই কবির মা তাঁকে 'কড়া ধমক' দেন, বলেন তিনি কোনো গল্পই জানেন না। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে ভাত খেতে অভ্যস্ত থাকা শিশুটি মায়ের এরকম অদ্ভুত আচরণের কারণ সেদিন বুঝতে না

পারলেও পরবর্তীকালে মায়ের ছেলেবেলার ঘটনা জানার পর তাঁর চোখে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি জানতে পারেন যে, আর পাঁচজন শিশুর মতো তাঁর মায়ের ছেলেবেলা না, মায়ের এই নিঃসঙ্গ একাকী ছেলেবেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন— "তাঁর না ছিল ঠাকুমা, না ছিল মা, একবছর বয়স থেকে মানুষ হয়েছিলেন পিসির কাছে।"[৩]

গ্রামের খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছেলেটিকে গ্রাম থেকে পড়াশোনা করার তাগিদে কলকাতায় আসতে হলেও এই বড়ো বড়ো বাড়ি, শান বাঁধানো রাস্তা, লোকের ভিড়ে মোড়ানো এই বদ্ধ পরিবেশ প্রথম দিকে তাঁর একটুও ভালো লাগত না, তাঁর মন কেবলই ফিরতে চাইত চান্দ্রা গ্রামে তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে। যদিও পরে কলকাতাকে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখে যান। কলকাতাকে আসতে আসতে ভালোবাসতেও শিখে যান।

মায়ের কাছে গল্প না শুনলেও বাবার কাছে তিনি অবশ্যই গল্প শুনতে পেতেন, গ্রিক পুরাণের গল্প, ইতিহাসের গল্প, খেলার মাঠের গল্প, ছড়া আরও কত কি। শুধু তাই নয় কবির জীবনের প্রথম বই, একেবারে নিজের বলতে যা বোঝায় তাও কবিকে প্রথম হাতে তুলে দেন তাঁর বাবাই। তাঁর হাতে 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী' বইটি তুলে দিয়ে তাঁর বাবা যখন বলেন— "এখনও তোর হাতে খড়ি হয়নি, কিন্তু দিব্যি তো পড়তে পারিস, পড়ে দ্যাখ, যেমন গল্প তেমন ছড়া, খুব মজা পাবি।"[৪] এই যে প্রথমে গল্প, ছড়া শোনানো, তারপর নিজেকে গল্প ও ছড়ার বই পড়ার মধ্য দিয়ে তাঁর বাবা তাঁকে যে জগতের সঙ্গে খুব সহজেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাওয়া খাওয়া ঘুম কেড়ে নিয়ে বই-এর প্রতি বলা ভালো সৃজনশীল সৃষ্টির প্রতি তাঁর যে একটা আগ্রহ গড়ে তুলেছেন, এই আগ্রহ, এই ভালোবাসা তাঁর জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত কি তাঁকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে নি ?

আবার স্কুল শিক্ষক সুহৃৎকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তাঁকে শেখাচ্ছেন কী করে সহজ শব্দ দিয়ে সংক্ষেপে নির্ভুলভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, তাঁর বাবাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে যখন তাঁর বাবা তাঁকে বলেছেন 'রিপেয়ার্ড টু'-এর বদলে 'ওয়েন্ট', 'ব্রিদ্‌ড হিজ লাস্ট'- এর বদলে 'ডায়েড' লিখলেও কোনো কিছু আসে যায় না। কারণ একজন বক্তা যখন তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তিটির কাছে কোনো কিছু বলতে চাইলে তা যদি তিনি 'শক্ত শক্ত শব্দ' প্রয়োগ না করে সহজ সরল শব্দ প্রয়োগ করে বিষয়টি উপস্থাপন করে তা হলে বক্তার অভিপ্রেত বিষয়টি সহজেই শ্রোতার কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে। কোনো বক্তব্য বিষয়কে সহজ সুন্দর সাবলীলভাবে উপস্থাপনা করার পাঠ এভাবেই তিনি তাঁর শিক্ষক মহাশয় ও বাবার কাছে গ্রহণ করেছিলেন। যা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এবং অন্য কারোর চেয়ে তাঁর রচনার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।

কবিতা লেখার ঝোঁক নীরেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। তিনি ছোটবেলায় পাড়ার দাদা-দিদিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিতা লিখতেন। তবে কবে থেকে যে কবিতা লিখছেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—

> কাকে যে কবিতা বলে সেটাই এখনও পর্যন্ত ভালো করে বুঝে উঠতে পারলুম না। রচনার মধ্যে কোন জিনিসটা থাকলে কবিতা বলে সেটা যে কী জিনিস এটা নিয়ে এখনও আমার ধন্ধই কাটেনি।[৫]

তিনি ছোটবেলায় যেগুলো লিখেছেন সেগুলো কি কবিতা হতো ? এ প্রশ্ন বারবার তাঁর মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আবার নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে, তাতে এক ধরনের মিল থাকত

ঠিকই, তবে এগুলোকে একধরনের পদ্য বলা চলে, কবিতা লেখার জন্য যে ভাবনা দরকার তারই প্রারম্ভ পর্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তাঁর চার-পাঁচ বছর বয়সে একদিন রাত্রিবেলায় বড় কাকিমাকে তিনি বলেছিলেন— 'রাত হল ভাত দাও'। একথা শুনে তাঁর কাকিমা বলেন, তুই যে দেখি কবিদের মতো কথা বলছিস। তাঁর ভাত চাওয়ার মতো একটা স্বাভাবিক ঘটনায় তাঁর বড় কাকিমার এই যে ইঙ্গিতবাহী উত্তর এটাই কি কোথাও তাঁর মনে কবি নীরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার দিককে ইঙ্গিত দিইয়েছে, কাকিমার এই ইশারাই কি তাঁকে পরোক্ষভাবে লেখালেখির কাজে প্রেরণা জোগাচ্ছে না?

তিনি মিত্র স্কুলে পড়াকালীন কবিতা লিখতেন লুকিয়ে লুকিয়ে। মিত্র স্কুলের শিক্ষক মহাশয় কৃষ্ণদয়াল বসু যিনি কিনা নিজেও লেখালেখি করতেন, তিনি তাঁর এই কবিতা লেখার বিষয়ে কখনও টেরই পাননি। যদিও পরবর্তীকালে কাগজে তাঁর (নীরেন্দ্রনাথের) লেখা পড়ে, লোকমুখে জানতে পারেন এটি তাঁর ক্লাসের ছোট্ট ছাত্র নীরেন পাঠকমহলে যাঁর পরিচিতি আজ কবি নীরেন্দ্রনাথ হিসাবে।

গ্রাম বাংলার নানান অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে তাঁর কবিতায়। তিনি চারপাশে যা দেখেছেন গাছপালা, পরিবেশ, নানান মানুষ, তাই নিয়েই তিনি কবিতা লিখেছেন। কবিতার সঙ্গে কল্পনার যোগ সহজাত হলেও তাঁর কবিতায় কোনো কল্পনার ফানুস স্থান পায়নি, কল্পনা ছাড়া কীভাবে কবিতা লেখেন এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন— "আমি হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ানো লোক। লোকের মুখের কথা শুনি, লোক যেভাবে কথা বলে সেটাই আমার কবিতার উপকরণ।"[৬]

কলকাতায় এসে নীরেন্দ্রনাথ প্রথম বঙ্গবাসী স্কুলে ভর্তি হন। পরে মিত্র ইনস্টিটিউশনেও একবছর পড়াশোনা করেছেন। ১৯৪০ সালে বঙ্গবাসী থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলেও ১৯৪২ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ পাশ করেন। প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত অনেক সময় এর উপরই নির্ধারিত হয়ে যায় একজন ছাত্রের গোটা ভবিষ্যৎ, আই. এ পরীক্ষায় ভাল ফল করার পর ইংরেজিতে অনার্স নেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর বাবা যখন নিষেধ করে বলেন যে ওটা একটা জ্যান্ত ভাষা ওর চালচলন, ধরন-ধারণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভবপর নয়, বরং ইতিহাস নিয়ে পড়লে ভালো হবে। প্রথম দিকে তাঁর ইতিহাস পড়তে ভালো না লাগলেও পরবর্তীতে সেন্ট পর্ল্স কলেজের শান্ত ও শৃঙ্খলাময় পরিবেশ, মিলফোর্ড ও সুবিমল দত্ত মহাশয়ের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ভালোই লাগে। ইতিহাস নিয়ে পড়ার সময় কবিতাচর্চার পাশাপাশি খেলাধূলোর প্রতিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, ১৯৪৪ সালে এই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। এরপর মায়ের ইচ্ছায় ল' নিয়ে পড়া শুরু করলেও তা আর কমপ্লিট করেননি।

তিনি পড়ার বই এর থেকে গল্পের বই বেশি পড়তে পছন্দ করতেন, ভূতের গল্প, গোয়েন্দা গল্প, অ্যাডভেঞ্চার গল্প। গল্পের বই পড়ে যেটুকু সময় হাতে পাওয়া যেত সেটুকু সময় তিনি ব্যয় করতেন পদ্যের মিল খোঁজার কাজে, তাই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর তেমন রইল না, মা সহ বাড়ির অন্যান্য সকলে কবির এই অভ্যাসে চিন্তিত হলেও এ বিষয়ে কবির বাবার সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। তিনিই তাঁকে জানান যে স্কুলের পড়া শেষ হলে কলেজে যে বিষয় নিয়ে পড়তে বেশি ভালো লাগে তা নিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবি। সেকালের আর পাঁচজন বাবা-মার মতো কবির মাও তাঁকে লাইন ধরানোর চেষ্টা করলে তিনি বলেন—

> আমি কিচ্ছু হব না। ম্যাট্রিক পাশ করে আমি দেশের বাড়ি ফিরে যাব। গিয়ে চাষবাস করব।[৭]

লোকনাথ চক্রবর্তীও তাই চেয়েছিলেন প্রথমদিকে।

কলেজে পড়াকালীন তাঁর বাবা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। এসময় কবির জীবনে এক বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁর বাবা প্রায় একরকম শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে, পরিবারের পাশে থাকতে, নিজের হাত খরচ জোগাতে বি.এ পড়াকালীনই 'প্রত্যহ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকার কাজে যুক্ত হন। এভাবেই তার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়। এছাড়াও তিনি *শ্রীহর্ষ, মাতৃভূমি, স্বরাজ, ভারত, নবযুগ, সত্যযুগ* প্রভৃতি পত্রিকায় জীবন ও জীবিকার তাগিদে তিনি কাজ করেছেন এবং পরে ১৯৫১ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকা* -র সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তিনি তিনশো টাকা মাইনেতে সরকারি চাকরি করলেও তা তার ভালো লাগত না, সরকারি অফিসের দমবন্ধ পরিবেশের থেকে খবরের কাগজের খোলামেলা পরিবেশেই তিনি ফিরতে চাইতেন। তাই তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার কাজেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

শ্রীহর্ষ পত্রিকায় কাজ করা কালীনই পরিচয় হয় শ্রীমতী সুষমা রায়ের সঙ্গে, যাঁকে আমরা পরবর্তীতে কবির জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাচ্ছি। কবিকে তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছে দিতে ও কর্মপথে সর্বদা সজাগ থাকতে প্রেরণা জুগিয়েছেন।

ধাই মাকে ছোঁয়া ও স্নান করা প্রসঙ্গে তাঁর মা যখন বলেন, যে খোকার জন্মের পরই যার কোলে চেপেছিল তাঁকে ছুঁলে আজ যদি ওঁকে স্নান করতে হয়, তবে আমাকে ছুঁলেও তাঁকে স্নান করতে হবে। এভাবে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, জাতপাত সম্পর্কে ছোঁয়াছুঁয়ির যে ধারণা তার পাঠ গ্রহণ করেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে।

তাঁর বন্ধুভাগ্য যে খুব ভালো ছিল একথা তিনি নিজ মুখেই 'নীরবিন্দু'-তে স্বীকার করেছেন। তাঁর এই হয়ে ওঠা-র পিছনে তাঁর বন্ধুদের অবদান অপরিসীম। তিনি বলেন— তাঁর প্রথম কবিতার বই বের হয় অনেক দেরিতে। একদা তাঁর বন্ধু অরুণকুমার সরকার তাঁকে বলেন দিলীপ গুপ্ত মহাশয় তাঁর কবিতার বই ছাপতে চেয়েছেন, তাই তাঁকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। একথা শুনে নীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন ও বই ছাপার পর জানতে পারেন দিলীপ গুপ্ত মহাশয় আসলে তাঁর না অরুণকুমারের বই ছাপতে চেয়েছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ এ নিয়ে তাঁর বন্ধুর কাছে প্রশ্ন করলে অরুণকুমার বলেন— "আসলে কবিতা লেখাটা আমার শখের ব্যাপার। ... কিন্তু তোর তো গোটা এক্সিসটেন্স নির্ভর করছে কবিতার উপর। কবিতা না লিখলে তুই তো মারাই যাবি।"[৮] এভাবেই তাঁর প্রথম কবিতার বই 'নীলনির্জন' ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর আর এক বাল্যবন্ধু বাদল, সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলার ক্ষেত্রে যার জুরি মেলা ভার। অন্যদিকে নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাদলের একেবারে বিপরীত। তাঁর এই জেদি স্বভাব, লেখাপড়ায় অমনোযোগী, পরিস্থিতি অনুযায়ী গুছিয়ে কথা বলতে না পারা বন্ধুটিকেও বাদল যে ভালোবাসত তার একটা বড় কারণ হল তাঁর পদ্য লেখা, আমাদের নিত্যদিনের কথাবার্তা, আমাদের গাছপালা, আমাদের পরিবেশ, আমাদের জীবনযাপন এসব নিতান্ত মামুলি বিষয়, যা আমাদের খুবই চেনা তাকে পদ্যের বিষয়বস্তু করে পটাপট লাইনের মিল দিয়ে লেখার এই পারঙ্গমতা দেখে বাদলবাবু নিজেই খুব অবাক হতেন। শুধু তাই নয় নীরেন্দ্রনাথের এই পদ্য লেখার ব্যাপারটা নিয়ে বাদলবাবু খুবই গৌরববোধ করতেন। তাঁর সাহায্যেই নরহরিদার মধ্যস্থতায় 'চলতি পথে' নামক হাতে লেখা পত্রিকায় তাঁর লেখা বের হয়। আবার এ প্রসঙ্গে তাঁর আর একজন বন্ধুর কথা না বললেই নয় তিনি হলেন শৈলেন।

পত্রিকায় কাজ করার সময় রাত জাগার জন্য নীরেন্দ্রনাথের যাতে লেখালেখির কাজে কোনোরকম প্রভাব না পড়ে সেজন্য শৈলেন নিজেই তাঁর হয়ে রাত জেগে দিতেন, তিনি বলতেন,

"দিনে কি তুই ঘুমুবার সময় পাস? তোর ল-কলেজ আছে, অ্যার্টনি আপিস আছে, তার ওপরে আছে 'শ্রীহর্ষ'র কাজ, তা ছাড়া আছে নিজের লেখালেখি, আমার ওসব ঝঞ্ঝাট নেই। দুপুরে টানা ঘুমিয়ে রাতের ঘাটতি পুষিয়ে নেব। তুই ঘুমিয়ে পড় তো।"[৯] এরকম বন্ধুভাগ্য ছিল বলেই হয়তো নীরেন্দ্রনাথ অর্জুনের পাখির চোখ বিদ্ধ করার মতো বাংলা কাব্যের জগতে নিজেকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তুলে ধরতে পেরেছেন একজন সৃষ্টিশীল কবি ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

তাঁর একেবারে প্রথম দিকের লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ছাপ পড়লেও পরবর্তী সময়ে তাঁর লেখায় জীবনানন্দের চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি কলেজে পড়ার সময় অনেকবার *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পড়েছিলেন। কবিতা সম্পর্কে আঠারো-উনিশ বছর বয়সে তিনি যা ভাবতেন *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পড়ার পর তাঁর সেই ধারণায় আমূল পরিবর্তন আসে, তিনি 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' এই একটি শব্দের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দর সাহিত্যসৃষ্টির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন।

'নীলনির্জন' (১৯৫৪)-এর পরে প্রকাশিত হয়েছে 'অন্ধকার বারান্দা' (১৯৬১), 'নীরক্ত করবী' (১৯৬৫), 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (১৯৬৯), 'কলকাতার যীশু' (১৯৬৯), 'উলঙ্গ রাজা' (১৯৭১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বহু পুরস্কার পান ও নানা সম্মানে সম্মানিত হন। তিনি 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে *সাহিত্য আকাদেমি* পুরস্কার পান। এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠক সমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নির্ভীক ছোট্ট শিশুটির মুখে উচ্চারিত হওয়া 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' পঙ্‌ক্তিটি অশালীন সমাজকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। যার জন্য নীরেন্দ্রনাথ আজও পাঠক মহলে বহুচর্চিত নাম।

কবিতা লেখার থেকে সময় বাঁচিয়ে যতটুকু পরিসর পাওয়া যায়, সেটুকু সময়েই তিনি গদ্য লিখতেন। আসলে কবিতাই ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি মূলত কবিতা লেখেন বা কবিতার বিষয়ে গদ্য লেখেন। তিনি গল্প, উপন্যাস লাইনের লোক যে ছিলেন না একথা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করেন। কবিতাতে যাপন করতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন।

তাঁর এই লেখালেখির জগতে আসার প্রারম্ভিক পথটা খুব যে মসৃণ ছিল এমন নয়। এই লেখালিখির জন্য তাঁকে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাস সহ্য করতে হয়েছিল। তবুও তিনি এসব কিছুর ঊর্ধে গিয়ে নিজেকে সৃজনশীল সাহিত্য রচনার কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পাঠক মহলে একজন প্রবাদপ্রতিম কবি ও সাংবাদিক রূপে পরিচিতি পেয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে,জ পাবলিশিং' কলকাতা-৭৩, ষোড়শ সংস্করণ: মাঘ ১৪২১/ জানুয়ারি ২০১৫ (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৭/ মে ১৯৭০), পৃ. ১২৮।

২. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, নীরবিন্দু (অখণ্ড), দে,জ পাবলিশিং' কলকাতা-৭৩, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬১৪২৩ বৈশাখ /, পৃ. ৩০।

৩. তদেব, পৃ. ১০৭।

৪. তদেব, পৃ. ১০৮।

৫. Documentary film by @Sahitya Akademi on Nirendranath Chakraborty (Bengali) Directed by Amiya Chattopadhyay from the archives of Sahitya Akademi, https://youtu.be/F3_8lurEOkY?si=5e2RcHK0E34zVU_n, 10:01-10:22 minitues.

৬. সাক্ষাৎকার : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮, https://www.prothomalo.com/onnoalo/%E2%80%98%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%87-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E2%80%99

৭. পূর্বোক্ত নীরবিন্দু (অখণ্ড), পৃ. ১৫৮।

৮. সাক্ষাৎকার: চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, দত্ত হর্ষ (সম্পাদিত), বইয়ের দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড২০০৬ জুন-এপ্রিল ,, পৃ. ১৪২-৪৩।

৯. পূর্বোক্ত নীরবিন্দু (অখণ্ড), পৃ. ৩৯৩।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১২, সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা-৭০০ ০৫৯, বইমেলা ১৪১৮।

২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,৭০০০৭৩-কলকাতা ,জ পাবলিশিং'দে ,কবিতার কী ও কেন , পঞ্চম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

৩. বইয়ের দেশ, হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড২০০৬ জুন-এপ্রিল ,।